বেচারা

আবার মুখ ঘুরিয়ে বসলো তিষি। চোখে কান্না কান্না ভাব। ছেলে মেয়ে দু'টো ঘরেই। সাথে ওদের আছে ছোট খালা ছায়া। ওরা মুখ টেপাটেপি করে হাসছে। রেজা বিব্রত ভঙ্গিতে এ ওর মুখের দিকে তাকালো। তিষির চোখে ঘন ঘন পলক। এর অর্থ রেজার কাছে পরিষ্কার। তিষি কোন কারণে তার ওপর ভয়ানক রেগে আছে। রেজা কিছুক্ষণ ডান পকেটে কিছু একটা খুঁজলো, কিছু না পেয়ে বাম পকেটে হাত ঢোকালো। কিন্তু না, সেখানেও কিছু নেই। প্যান্টের হিপ পকেট থেকে রুমালটা বের করে ডান হাত বাম হাত করে আবার রাখলো হিপ পকেটে। চিরুনিটা খুঁজছে। কিন্তু ওটা মাটির কঠিন কোলে গড়াগড়ি খাচ্ছে এখন। রুমালটা বের করার সময় কখন যে ওটা মাটিতে পড়েছে খেয়াল করেনি। অন্য সময় হলে ঠিক বুঝে ফেলতো। কিন্তু ঘরে ঢুকে তিষির মুখে মেঘের কাল ছায়া দেখে ওর সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মেয়ে দোয়েল এসে চিরুনিটা হাতে দিয়ে বললো—বাবা এটা খুঁজছ?

রেজা এতক্ষণে কিছু একটা বলতে পেরে বেজায় খুশি। বললো—বুঝলি কী করে? আরে আমি তো এটাই খুঁজছি। বলার ফাঁকে ফাঁকে ওর চোখ তিষির মুখ ঘুরে এলো। না কোন পরিবর্তন নেই সেখানে।

ছায়া মিটিমিটি হাসছে। ছোট শ্যালিকা ছায়া বেড়াতে এসেছে দিন তিনেক হলো। রনির গোঁফ গজাতে শুরু করেছে সবে মাত্র। সে তার বাবার বিব্রত মুখ খুব বেশি একটা দেখার সুযোগ পায় না। যখনই দেখে মনে হয় সেখানে একটা রাগী ভাব লেপ্টে আছে। আজ তার মজার মওকা। কিন্তু সাহস পেলো না। বন্ধুদের কাছে শুনেছে এক মাঘে শীত যায় না। কথাটা সে অক্ষরে অক্ষরে মানে। বাবাকে মাঘের শীতের বিব্রতকর অবস্থায় হাফ ঘর্মাক্ত দেখে তার হাসি পেলেও হাসলো না। রনি গোঁফের আড়ালে ঐ শান্ত মুখটাকে বেজায় ডরায়। ভাবছে আজকে ঐ বিশাল গোঁফের আড়ালে এতো অসহায় একটা লোক চিরুনি হাতে করছেটা কি ! সে খেয়াল করলে তার বাবা একবার চিরুনি দেখছে আর একবার তিষির দিকে তাকাচ্ছে। তিষির চোখে ঘন ঘন পলক এখনও অব্যাহত।

রনি ভাবলো, না এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তিষির দিকে তাকিয়ে বললো—মা, আমি গোসল করতে যাই?

তিরিক্ষি মেজাজে খিচড়ে উঠলো তিষি। বললো— যাবি যা, বড় হচ্ছিস, না ছোট? গোসল করার জন্য পারমিশন লাগে নাকি?

রনি পিছনে বিছানা থেকে নামতে নামতে বললো— না, এই আর কি, তোমাকে বলে যাওয়া দরকার কি না।

চুপ বেশি কথা বলবি না। প্রায় গর্জে উঠলো তিষি।

দুপুর গড়াচ্ছে। রোজা রমজানের দিন, উনি এখনো গোসল না করে আবার হুকুম দেবার নখড়া করছে। সব পাজি, বেয়াদব। টপটপ করে তিষির লাল চোখ থেকে গরম কয়েক ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এলো।

ছায়ার মুখে হাসি হাসি ভাব গায়েব। জানে, তিষি রেগে গেলে ঐ মুহূর্তে তার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কিছু বুঝতেও চাইবে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে বললো—দুলাভাই, অনেকক্ষণ পর বাইরে থেকে এলো কাপড় চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও।

রেজার মুখে এতক্ষণে কথা জোগালো। বললো— হ্যাঁ রে, তাই তো। আমারও গোসল করা দরকার, নামাজ পড়তে হবে। বলে আবার তাকালো তিষির দিকে।

তিষির সাথে ওর বৈবাহিক জীবন আঠার বছরের। আজ পর্যন্ত স্ত্রীকে বুঝে উঠতে পারলো না। কখন রাগবে আর কখন রাগবে না একমাত্র আল্লাহই জানেন। দোয়েল অবশ্য বেশি বিপদ দেখলে বাবার পক্ষ নেয় অথবা রাজনীতির ধারায় দু'জনকেই খুশি করে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আজ এখনও নির্বিকার। হুমায়ূন আহমেদের ছায়াবীথি পড়ছে। চিরুনিটা তুলে দেয়াই যেন ওর দায়িত্বের শেষ সীমানা। রেজা মনে মনে প্রত্যাশা করছে দোয়েল কিছু একটা বলুক। কিন্তু সে ভরসায়ও ছাই।

রেজাকে আবার থামতে হলো। তিষির কথায় ঢাকার রাস্তার স্বদেশি বোমা ফাটার আওয়াজ। বললো— তুমি আর গোসল নামাজ দিয়ে কী করবে? ভোর থেকে বাইরে ছিলে, বাইরেই থাক। তোমার তো আবার ঘরে মন বসে না।

স্বদেশি বোমা হলো সন্ত্রাসীদের হাতে বানানো জর্দার কৌটার বোমা। কথায় আছে না, ছোট মরিচে ঝাল বেশি। তেমনি আর কি, রাস্তায় ঐ জর্দার কৌটা ফাটলে অনেকেরই পিলে চমকে যায়। শোনা যায় ঐ ভয়কে সম্বল করেই কিছু কিছু বঙ্গরত্ন পুরুষদের পেটে ক্ষুরের পোচ লাগিয়ে হাসপাতালে পাঠায়, মেয়েদের গলায় চেইন কিংবা হার অবলীলায় টান মেরে সটকে পড়ে। এ যেন শ্যালিকার সাথে খুনসুটি। আবার এর চেয়ে মজার কাণ্ডও ঘটে। খাঁটি সোনার চেইন না পরার অনাকাঙ্ক্ষিত অপরাধে শাড়ি ধরে টানা-হ্যাঁচড়া বা ফর্সা গালে সদর্পে চড় বসিয়ে ভবিষ্যতে সোনার গয়না পরে রাস্তায় বেরোবার বায়নাই বা কম কিসে? দোয়েল ভাবছে মা'র কথার আওয়াজে যদি বাবার এই অবস্থা হয় তা হলে রাস্তায় পটকা ফুটলে হয়তো বাবাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

ও এই ব্যাপার। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো রেজা। বললো— এই জন্য রেগে আছ। আমি তো ভাবলাম আবার কী করেছি? বলে কান্নার মতো ছোট একটা হাসি ধরে রাখলো মুখে। ভাবছে এই ভাবেই যদি শেষ রক্ষাটা হয়।

কিন্তু না তা হলো না। তিষির গলা চড়লো। বললো—এর চেয়ে বেশি কী করবে? সারাদিন বাইরে বাইরে থাক। আমাকে এখন আর তোমার ভাল লাগে না। নিশ্চয় কাউকে জোগাড় করেছ? কখনো ভালবাসার চোখে আমার দিকে তাকাও? ঝরঝর করে ওর চোখের অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে।

ছায়া হি হি করে হেসে উঠলো। রনি তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলো। মায়ের মারমুখো মূর্তি দেখে সাথে সাথে সেও উধাও। দোয়েল ছায়াবীথির পাতা উল্টালো। কিন্তু বইয়ের ফাঁক দিয়ে একবার মা'র রণরঙ্গিনী মুখ দেখে নির্বিকারভাবে আবার মন দিলো ছায়াবীথিতে।

রেজা হাসার চেষ্টা করলো। বললো—রোজা রমজানের দিনে কি যা তা বলছো! আমাকে কী তোমার এতোই খারাপ মনে হয়?

ছায়া বললো—দুলাভাই, আপা বারোটা থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। এতক্ষণ তো হাসি-খুশিই ছিলো।

রেজা এবার একটু সাহস পেলো। খুশি খুশি কণ্ঠে বললো—জানো, বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে মন্ত্রীকে দাওয়াত দিতে গিয়েছিলাম।

তিষি এবার উঠে বসলো। যেন গরম তেলের কড়াই ঝাঁকিয়ে উঠেছে। হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেললো দূরে। বললো—সকাল দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত মন্ত্রী সাহেব কী তোমাকে কোলে তুলে চুমো খেয়েছে ? সে কী তোমার শ্বশুর? বলতে বলতে আর একবার চোখ আর নাকের পানি মুছলো তিষি।

রেজা এমনিতেই রসিক মানুষ। পারিবারিক কলহে তার আবার রসবোধ বেড়ে যায়। বললো—তোমার মতো মেয়ে ভাগ্য হলে মন্ত্রী মশাই কষাইয়ের কাজ করতো। হাতে থাকত বড় দাও। তা দিয়ে তোমার কথা মতো তোমার সুপ্রিয় স্বামী সাহেবকে পাহারা দিতো। খবরদারি করতো সর্বক্ষণ। আর তুমি নিশ্চিত মনে বন্ধ দরজার আড়ালে খিলির পর খিলি পান শেষ করে চলতে।

রসিকতা তিষিকে স্পর্শ করলো না। বললো ভাঁড়ামি করে কথা এড়াচ্ছ, মন্ত্রীর বাসায় নিশ্চয়ই তুমি এতক্ষণ ছিলে না!

আলবত ছিলাম না। রেজার নির্বিকার জবাব।

তা আর কী কী করেছ, জানাবে? আবেগ সংযত করে তিষি আবার জিজ্ঞেস করলো।

ছায়া বাধ সাধলো। বললো—আপু। তুমি দুলাভাইকে জেরা না করে গোসল সেরে রেস্ট নিতে দাও। বেচারা সারাদিন খাটখাটনি করে এলো।

তিষির মেজাজ তিরিক্ষই রইলো। চোখ পাকিয়ে তাকালো ছায়ার দিকে। বললো— দু'দিনের বাচ্চা, টিপ দিলে নাক দিয়ে দুধ বেরোবে, তুই কী বুঝিস? একদম চুপ থাক। রেজার দিকে ফিরলো সরোষে। জিজ্ঞেস করলো— তারপর কী করলে?

শার্ট খুলতে বোতামে হাত দিয়েছে রেজা। প্রথম বোতামটা খুলতে খুলতে বললো— ওখান থেকে পাবলিশার। তারপর একটু দোকানে গেলাম, গুলশানে।

তিষির চোখে আবার টলটল করছে পানি। বললো—এই ঈদের বাজারে তুমি দোকানে গেছ, আমাকে ছাড়া! নিশ্চয়ই সবার সাথে ঠেলাঠেলি করে হাঁটহাঁটি করেছ !

একটু অবাক হয়ে রেজা বললো—সোফার দোকানে ঠেলাঠেলির জায়গা কই? দোকান তো একদম ফাঁকা। দু'জন দোকানিই শুধু বসেছিলো। একজন আবার বেজায় মুসল্লি, মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, সবসময় আল্লাহ আল্লাহ করেন। আর রোজার দিনে উপোস করে দোকানে দোকানে ঘুরে লোকজনের সাথে ঠেলাঠেলি করার বয়স কী আমার আছে!

হি হি করে হেসে ফেললো ছায়া। বললো—আপা, তুই দুলাভাইকে একটা ব্যাগে ভরে রাখ।

দোয়েল ছায়াবীথির পাতা উল্টাতে উল্টাতে আর একবার বাবা ও মা'র দিকে তাকিয়ে তাঁদের অবস্থান বুঝে নিলো।

তিষি চোখ মুছছে। বললো—বড় হলে বুঝবি স্বামী নিয়ে কত চিন্তা। ও আমাকে ফেলে বাজারে গেলো কেন?

ছায়া হাসছে। বললো—দুলাভাই, তুমি যাও। সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।

রেজা শার্ট খোলা শেষ করেছে। বললো—তোমার বোনের চোখের বান ডাকা পানি কমলে যেতে পারি।

তিষি আপা বাংলাদেশের মেয়ে। আষাঢ়, শ্রাবণ, বন্যা যে দেশের নিত্য সঙ্গী সেখানে চোখের পানি শুকোবে না। ছায়ার সংক্ষিপ্ত জবাব।

কি করলে বিশ্বাস করবে, আমি দোকানে দোকানে কারো সাথে গা ঘেঁষাঘেষি করে হাঁটিনি। আল্লাহর কসম বলছি, এবার হলো তো! রেজা তিষির দিকে তাকিয়ে প্রায় অনুনয় করে বললো।

পুরুষের আবার কসম! ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, এখনো রস কমলো না। তিষি স্বামীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বিষোদগার করলো।

হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রেজা, যেন বটবৃক্ষের তলায় বুদ্ধদেব। বললো—রোজা মুখে খোদার কসমে কাজ না হলে নিয়ে আস তোমার পবিত্র কোরআন। না হয় ছুঁয়ে বলি, শুধু সোফা দেখতে বাজারে গিয়েছি, কোন সুন্দরী রমণী নয়।

উঠে দাঁড়ালো তিষি। তার মুখ মোটামুটি স্বাভাবিক। বললো—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাইরে গেলে আর দেরি করবে না।

রেজা বাধ্য ছেলের মতো বলল—ঠিক আছে, আর দেরি করবো না। যে কাজগুলো নিয়ে যাবো শেষ হবার সাথে সাথে আবার ফিরে আসবো।

অল্প কাজ নিয়ে যাবে। তিষির কণ্ঠে হুকুম।

রেজা এতোক্ষণে হাসলো। হাসলে ওকে হিরো হিরো লাগে। বললো—অবশ্যই ম্যাডাম। অল্প কাজ নিয়ে যাবো, আর-----

আর কী? তিষি চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো।

তোমাকে একটা স্টপ ওয়াচ কিনে দেব। রেজার হাসি বিস্তৃত হলো।

ওটা দিয়ে আবার কি করবো? মনে হলো তিষি অবাক হয়েছে।

সময় গুনবে ম্যাডাম, ওটা ভাল সময় দেয়। এক সেকেন্ডের একশত ভাগের এক ভাগও মাপা যায়। হাসছে রেজা। হাসতে হাসতে বললো—এর সাথে একটা মোবাইলও দেব। আমিও নেব একটা।

কেন আমাকে চাঁদে পাঠাবে না কী? তিষির কণ্ঠে সত্যিকারের বিস্ময়।

না, না, না, চাঁদে যেতে হলে তো মোবাইলের পরিবর্তে স্যাটেলাইটের কথা বলতাম কিংবা রকেট। বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ালো রেজা।

সে কী? মোবাইল দিয়ে ঈদ করবে নাকি? বাচ্চাদের জামাকাপড় কিনতে হবে না? তিষির বিস্ময়ের মাত্রা বাড়লো।

ঈদ, বাচ্চাদের! রেজা রীতিমতো অবাক? বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বললো—ঈদ, তা পরে হলেও চলবে। শোন, আমি যখন বাসা থেকে কোন কাজে বেরুব, তুমি স্টপ ওয়াচ অন করবে। দশ মিনিট পরপর মোবাইলে যোগাযোগ করবে আমার লোকেশন নেবে। তা হলে তুমি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারবে। ইয়েস, মাই ডিয়ার ওয়াইফ, ইয়েস, ইয়েস। ইট্‌স এ ভেরি গুড আইডিয়া।

ছায়া হি হি করে হাসছে। ঠিক দুলাভাই—আমার প্রিয় আপামনি এবার শান্তিতে বাসায় বসে পান জর্দা ধ্বংস করতে পারবে। সাথে সাথে তার দিলও ঠাণ্ডা হবে। হতে পারে দু'একটা গান টানও শুনবে। হাসতে হাসতে বললো ছায়া।

ছায়ার দিকে ফিরে একটা প্রাণকাড়া হাসি দিলো রেজা। বললো—তাই নাকি রে ছোট? তোর আপা আবার গান শুনে নাকি?

শুধু কি শুনে, মেজাজ-মর্জি ভাল থাকলে গলা ছেড়ে গায়ও। ছায়া হাসলো হি হি করে।

রেজা আঁতকে উঠলো বললো—বিলকিস! একটু আগে যে ভাষায় গাইলো, সেই ভাষায়? প্রতিবেশীরা তো তাহলে পালাবে!

ছায়া হাসির মাঝে গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনলো। বললো—আবার আন্ডার এস্টিমেট করছো। অনেক গল্প শুনেছি তোমার। আপুর গান শুনেই নাকি দেওয়ানা হয়েছিলে!

এবার গাম্ভীর্যে ভাটা পড়ল তিষির মুখে। বললো—তোমরা থামবে?

রেজার দিকে ফিরে বললো— যাও, গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নাও। তবে মোবাইলের আইডিয়াটা মন্দ না। মুচকি মুচকি হাসছে তিষি।

রেজা বাম হাতে শার্টটা দোলাতে দোলাতে নিশ্চিত মনে প্রস্থান করছে। ছায়া দোয়েলের দিকে ফিরে বললো—দুলাভাই, গালি খেয়ে ধীরে ধীরে গোল হয়ে যাচ্ছে।

নাচের ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো রেজা। বললো—নো, নো মাই ডিয়ার। গালি খেতে খেতে আমি গালি-প্রুফ ডিনামাইট হয়ে গেছি। ফাটলে ফুলের সুগন্ধ ছড়াবে।

পিতার প্রস্থানের পর দোয়েল বইটা নামিয়ে রাখলো বুকে। ছায়ার চোখে চোখ রেখে একটু হাসলো! বললো—বেচারা!

কান্না

শুনেছি কুমিল্লায় ওরা নিষ্ঠুরের মতো মেরেছে। সব বাঙালি সৈনিককে মেশিনগানের মুখে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে এক সাথে। আমি যেন দিব্য দেখতে পাচ্ছি, গুলির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, রক্তাক্ত। নরঘাতকের উল্লাসের মাঝে ওর দেহ নিশ্চল হয়ে গেলো। বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠলো রাখি। বললো—না, নেই। তোর দুলাভাই আর নেই! হু হু করে কাঁদছে রাখি। ছোট ছোট চারটে বাচ্চা এতিম হয়ে গেলো! এখন আমি কি করবো! অস্থির ভাবে বারবার চোখ মোছে ও।

একাত্তরের এপ্রিল মাস। যুদ্ধ শুরু হয়েছে সপ্তাহ তিনেক। এখনও ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি অনেকেই। কি নৃশংস বর্বরতা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর! দাউ দাউ করে জ্বলছে নগর, বন্দর, জনপদ! নিরস্ত্র যুবা, বৃদ্ধ কিংবা শিশু অসহায়ের মতো মরছে ওদের জিঘাংসার তপ্ত বুলেটে। হিংস্র হায়েনার চোখেমুখে দানবের উল্লাস। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ক্লান্ত মানুষের ঢল নেমেছে গঞ্জ আর জনপদে। স্রোতের মতো এখনো সে ঢল অব্যাহত।

দ্রুত দানা বাঁধছে সংগ্রামী চেতনা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক আর কালুরঘাট ব্রিজের বেতার কেন্দ্র দ্রুত মুক্তিযুদ্ধকে সংঘবদ্ধ করছে। বিন্দু থেকে উত্থান শুরু হলো মুক্তিবাহিনীর। দলে দলে ভিড়লো মুস্তাফিজ, হারুন, হাসান, জগলুল, মোতালেব ও মশিউর। কোন প্রশিক্ষণ নেই লড়াইয়ের। কিন্তু সীমাহীন দেশপ্রেম আর পাহাড় সমান মনোবল সংগঠিত করে চলেছে মুক্তিবাহিনীকে, শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। পাকিস্তানি দানবীয় শক্তিকে রুখে দাঁড়লো ওরা অমিত তেজে। প্রথমে রামদা, বল্লম, লাঠি ও পরে কিছু থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। গ্রাম্য মাতব্বরদের কাছে থেকে কিছু বন্দুকও হাতে এলো। কিন্তু তাও তো কম নয়। ওদের মনোবল বাড়াতে যোগ হলো আর এক মাইল ফলক।

এখন আর পালানো নয়। হয় মার, নয় হয় মর। শুরু হলো লড়াই। অসম অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গ্রামের কৃষক, স্কুল-কলেজের ছাত্র, চাকরিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী, বাঙালি সৈনিক, দলছুট কিছু বিডিআর, পুলিশ, আনসার হাসিমুখে আত্মাহুতির গনগনে আগুনের দিকে জোর কদমে এগিয়ে গেলো। কোন পিছুটানই তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। মায়ের স্নেহ, সন্তানের ভালবাসা, কিংবা প্রেয়সীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখ গৌণ হয়ে গেলো দেশপ্রেমের কাছে। এদেশ আমার। এদেশ আমার ভালবাসা। এদেশ সমগ্র বাঙালির। এ আমার অহংকার। দানবের হিংস্র নখর হতে একে বাঁচাতেই হবে। এখানে কোন কিন্তু নেই, কোন প্রশ্ন নেই। আছে শুধু প্রত্যয় আর স্বদেশের প্রতি বুকভরা গভীর মমত্ববোধ। যে গ্রেনেডের কথা শুনলে ওরা এক সময় আঁতকে উঠত, সেই গ্রেনেড এখন ওদের কাছে ছেলেবেলায় ঘর পালিয়ে মার্বেল খেলার মতো অতি সাধারণ। গাছ থেকে পেড়ে আনা সবুজ পেয়ারা যেন! রাতের অন্ধকারে শত্রুর বাংকারে ছুঁড়ে মারায় ওদের মনে এখন খেলে যায় এক ধরনের ঘোরলাগা আনন্দ।